বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও এর প্রভাব

ইউনিট ৩

১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে। তবে আজকের বাংলাদেশ প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক সীমারেখার একটি বড় অংশ মাত্র। বিশ্ব মানচিত্রে দেশটির অবস্থান এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে। বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশি। দক্ষিণ-পূর্বে মায়ানমার (বার্মা)। বাকি তিন দিকের সীমানা ঘিরে আছে ভারত। অবিভক্ত বঙ্গদেশ একটি বদ্বীপ। আমরা সমগ্র বদ্বীপকে প্রধানত দুভাগে চিহ্নিত করতে পারি। প্রথমত, মৃতপ্রায় বা প্রাচীন বদ্বীপ যার অধিকাংশ পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। দ্বিতীয়ত, সক্রিয় বদ্বীপ যার প্রায় সবটাই পড়েছে পূর্ববঙ্গে বা বর্তমান বাংলাদেশে। বাংলাদেশে বদ্বীপ গঠন প্রক্রিয়া এখনও চলমান। নদীই বাংলার ইতিহাস ও সভ্যতার জন্মদাতা। বাংলাদেশের বুক জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ছোট-বড় অনেক নদ-নদী ও খাল-বিল। বাংলাদেশের প্রায় সব জনপদই সমতল। কিছু কিছু পাহাড়ি বনাঞ্চলও রয়েছে। চির সবুজে ঘেরা শস্য-শ্যামলা নাতিশীতোষ্ণ দেশটি মানুষের বসবাসের জন্যে এক চমৎকার আবাসভূমি। সামগ্রিক ভৌগোলিক প্রভাবের কারণে এদেশবাসী সাধারণত ভাবুক, শান্ত-কোমল, উদার এবং স্বাধীনচেতা। এই ইউনিটে আমরা বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, বৈশিষ্ট্য ও জনজীবনে এর প্রভাব বিষয়ে জানব।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৩.১ ঃ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিচিতি
পাঠ-৩.২ ঃ বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি ও এর প্রভাব

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-৩.১ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিচিতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশের অবস্থান বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচয় দিতে পারবেন।
- বাংলাদেশের নদ-নদীর বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সীমারেখা, স্বাধীন সার্বভৌম, সবুজের আস্তরণ, ম্যানগ্রোভ, সমতট, ঐক্যসূত্র।

বাংলাদেশের অবস্থান ও পরিচিতি

বিশ্ব মানচিত্রে এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অবস্থান । আজকের যে বাংলাদেশ তার দক্ষিণ সীমান্তে রয়েছে বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশি। দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে মায়ানমার (বার্মা)। বাকি তিন দিকের সীমানা ঘিরে রেখেছে ভারত।

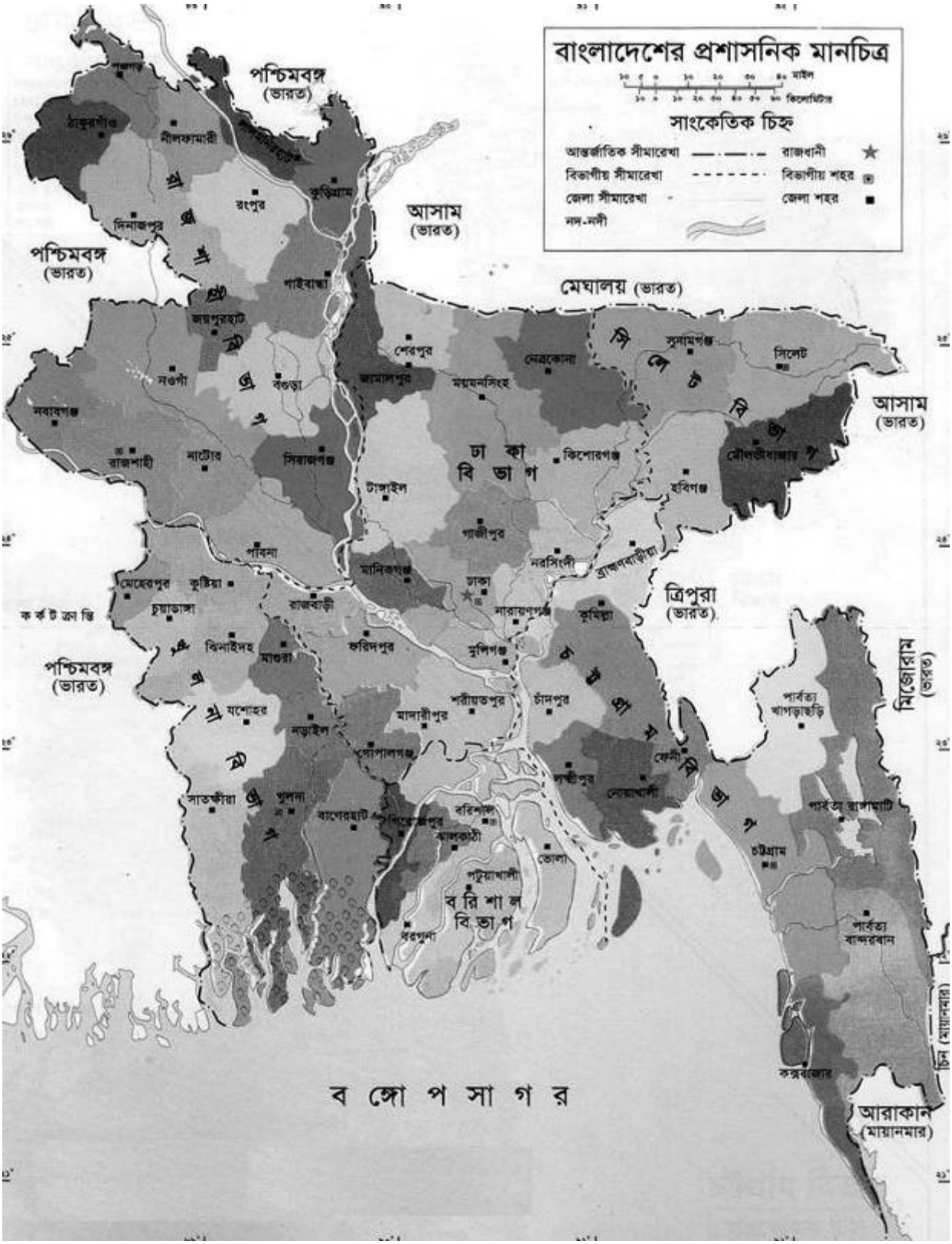

বাংলাদেশের মানচিত্র

উত্তর সীমানা

বাংলাদেশের উত্তর সীমার অদূরে রয়েছে হিমালয় পর্বত। উত্তর সীমায় আরো রয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, অরুণাচল ও আসাম রাজ্য ।

পূর্ব সীমানা

বাংলাদেশের পূর্ব সীমায় রয়েছে ছোট-বড় অনেক পাহাড়। যেমন আসাম ও গারো পাহাড়, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়, দক্ষিণে লুসাই, চট্টগ্রাম ও আরাকান পর্বতশ্রেণি। পূর্ব-দক্ষিণে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পর্বত শ্রেণি বাংলাদেশকে লুসাই জেলা ও মায়ানমার (বার্মা) থেকে পৃথক করেছে।

পশ্চিম সীমানা

বাংলাদেশের পশ্চিম সীমানায় রয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও রাজমহলের পাহাড়ি এলাকা। এছাড়াও পশ্চিমের সীমারেখায় সাঁওতাল পরগনা, ঝাড়খণ্ড ও ময়ূরভঞ্জের অরণ্যময় মালভূমি রয়েছে।

দক্ষিণ

বাংলাদেশের দক্ষিণ সীমায় বঙ্গোপসাগর এবং তার কূল বরাবর সমতট ভূমিতে গাছগাছালি দিয়ে ঘেরা সবুজের আস্তরণ। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে রয়েছে বাংলাদেশের ফুসফুস হিসেবে পরিচিত সুন্দরবন। সুন্দরবন হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রীষ্ম-অঞ্চলীয় (ম্যানগ্রোভ) বনভূমি।

পূর্ব ভারতের বিশাল এলাকায় সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রধানত বাঙালি জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে আসছে। প্রাচীনকাল থেকে অনেকবার বাংলাদেশের রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে। কিন্তু, একটি ভৌগোলিক ঐক্যসূত্র রয়েছে।

নানা ঘাত-প্রতিঘাত, চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে পরিশেষে ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। ফলে বাংলাদেশের নিজস্ব ও সুনির্দিষ্ট সীমারেখা গড়ে ওঠেছে। বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭, ৫৭০ বর্গ কিলোমিটার।

বাংলাদেশের প্রধান নদনদী

নদী মাতৃক বাংলাদেশে জালের মতো জড়িয়ে আছে অনেক নদ-নদী । বাংলাদেশে বড় বড় নদ-নদীর উৎস দেশের বাইরে। নিচু অঞ্চল বলে বাংলাদেশের বুক চিরে নদীগুলো বয়ে চলে ক্রমে সাগরে গিয়ে মিশেছে । এখানে বাংলাদেশের প্রধান নদনদী সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হল।

পদ্মাঃ পদ্মা হচ্ছে গঙ্গা নদীর প্রধান শাখা। গঙ্গার পূর্ব-দক্ষিণবাহি প্রবাহকে বলা হয় পদ্মা। প্রাচীনকালে পদ্মা এত বড় নদী ছিল না, দেখতে খালের মতোই ছিল। তবে পদ্মা দশম শতকেরও প্রাচীন। পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র (যমুনা) গোয়ালন্দের কাছে এসে মিলিত হয়েছে। এই মিলিত প্রবাহ চাঁদপুরের কাছে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়ে সন্দীপের কাছে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। পদ্মার একটি প্রাচীনতম পথ রাজশাহীর রামপুর বোয়ালিয়া হয়ে চলন বিলের ভেতর দিয়ে ধলেশ্বরীর খাত দিয়ে ঢাকাকে পাশে রেখে মেঘনা খাড়িতে গিয়ে সমুদ্রে মিলিত হয়। তাই ঢাকার পাশের এই নদীটির নাম বুড়িগঙ্গা। বুড়িগঙ্গাই প্রাচীন গঙ্গা-পদ্মার খাত। মধুমতী ও আড়িয়াল খাঁ এখন পদ্মার প্রধান শাখানদী।

ব্রহ্মপুত্রঃ বাংলাদেশের প্রধান নদ হলো ব্রহ্মপুত্র। প্রাচীন কালে এর নাম ছিল লৌহিত্য। হিমালয়ের উত্তরে মানস সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়ে দেওয়ানগঞ্জের পাশ দিয়ে, শেরপুর ও জামালপুরের ভেতর দিয়ে, মধুপুর গড়ের পাশ দিয়ে ময়মনসিংহ জেলাকে দুভাগে ভাগ করে ঢাকা জেলার সোনারগাঁ পর্যন্ত প্রবাহিত। ঢাকা জেলার উত্তরে ব্রহ্মপুত্রের একটি শাখানদী হলো শীতলক্ষ্মা। ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমদিক দিয়ে ব্রহ্মপুত্রেরই সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে শীতলক্ষ্মা বর্তমান ঢাকার দক্ষিণে নারায়ণগঞ্জের কাছে এসে ধলেশ্বরীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আজ এর ধারা ক্ষীণ হলেও উনিশ শতকের গোড়াতেও লক্ষ্মা বেগবতী নদী ছিল।

যমুনাঃ বাংলাদেশের আরেকটি প্রধান নদী যমুনা। উনিশ শতকের মাঝামাঝি ব্রহ্মপুত্রের অন্যতম শাখা যমুনা প্রবল হয়ে ওঠে। যমুনা ব্রহ্মপুত্রের বিপুল জলরাশি বয়ে এনে গোয়ালন্দের কাছে পদ্মার প্রবাহে ঢেলে দিচ্ছে।

মেঘনা: মেঘনা বাংলাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ নদী। মেঘনার উদ্ভব খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়ে। উত্তর প্রবাহে মেঘনার প্রাচীন নাম সুরমা। সুরমা সিলেট জেলার ভেতর দিয়ে বৃহত্তর ময়মনসিংহের নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলার পূর্বসীমা স্পর্শ করে সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ জেলার আজমিরিগঞ্জ বন্দর ও অদূরবর্তী বানিয়াচঙ্গ গ্রাম বাঁ-তীরে রেখে ভৈরববাজারে এসে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে। ভৈরব বাজার থেকে সমুদ্র পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের যে ধারা তার নাম মেঘনা।

করতোয়া: উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে প্রাচীন নদী করতোয়া। করতোয়া প্রাচীনকালে একটি বড় নদী ছিল। ভুটানের উত্তরে হিমালয়ে করতোয়ার জন্ম। এরপর দার্জিলিং-জলপাইগুড়ির ভেতর দিয়ে নদীটি তিস্তা নাম ধারণ করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এরপর তিস্তার তিনটি স্রোত তিনদিকে প্রবাহিত হয়েছে। পূর্ব থেকে দক্ষিণে বয়ে যাওয়া স্রোতের নাম করতোয়া। মধ্যবর্তী স্রোতের নাম আত্রাই এবং দক্ষিণ-পশ্চিম স্রোতের নাম পুনর্ভবা নদী।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	১. শিক্ষার্থী বাংলাদেশের মানচিত্র এঁকে তার সীমানা পাওয়ার পয়েন্টে দেখাবে। ২. বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদীর মানচিত্র এঁকে গতিপথ দেখাবে।

সারসংক্ষেপ

ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ। দেশটি অবস্থানগত দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত। দেশটির তিন দিকে স্থল আর এক দিকে বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশি একে অপরূপ সৌন্দর্য দান করেছে। ম্যানগ্রোভ বন নামে পরিচিতি সুন্দরবন, বিভিন্ন নদ-নদী, পাহাড় পর্বত বাংলাদেশকে এক পৃথক পরিচিতি প্রদান করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের ফুসফুস হিসেবে কোনটিকে আখ্যায়িত করা হয়?
ক) সুন্দরবনকে খ) বঙ্গোপসাগরকে
গ) মধুপুরের বনভূমিকে ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়সমূহকে

২। পূর্ব ভারতের বিশাল এলাকায় সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রধানত যে জনগোষ্ঠীর বাস–
ক) উড়িয়া খ) মারাঠী
গ) বাঙালি ঘ) বিহারী

৩। কোন নদীর প্রাচীনতম পথ বুড়িগঙ্গা?
ক) মেঘনা খ) পদ্মা
গ) যমুনা ঘ) ব্রহ্মপুত্র

৪। আন্তনদের বাড়িটির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে প্রমত্তা পদ্মা নদী। পদ্মা, কোন নদীর প্রধান শাখা। (প্রয়োগ)
ক) যমুনা খ) ব্রহ্মপুত্র
গ) গঙ্গা ঘ) মেঘনা

৫। তিস্তা নদীর তিনটি স্রোতধারা হিসেবে কোনটি সমর্থনযোগ্য (উ: দক্ষতা)
ক) বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী, তুরাগ খ) সুরমা, কুশিয়ারা, সারা
গ) কর্ণফুলী, মাতামহুরী, হালদা ঘ) করতোয়া, পুনর্ভবা, আত্রাই

পাঠ-৩.২ বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি এবং এর প্রভাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের মানুষের জীবনে ভৌগোলিক প্রভাব উল্লেখ করতে পারবেন।
- রাজনৈতিক জীবনে ভৌগোলিক প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে ভৌগোলিক প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ব-দ্বীপ, কীর্তিনাশা, সুজলা, সুফলা, সমতল, নিম্নভূমি, জনপদ, অরণ্য, ভাঙাগড়া।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য

নদনদী দিয়ে বয়ে আসা পলি মাটির স্তর দিয়ে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ। উঁচু জায়গা থেকে নদীর স্রোতে যে অজস্র পলি অবিরাম ভেসে এসেছে তাই দিয়ে তৈরি হয়েছে বাংলার ব-দ্বীপের নিম্নভূমি। পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্ব বাংলার কিছুকিছু অংশ বাদ দিলে ভূতত্ত্বের দিক থেকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় সবটাই নতুন পলি পড়া মাটি। এই নতুন জমির উপর দিয়ে বাংলার বিভিন্ন নদ-নদী কতবার যে খাত পরিবর্তন করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। আবার এই নদী ভাঙ্গন বা খাত বদলে অনেক জনপদ বিনষ্ট হয়ে গেছে। তাই বাংলার নদীকে অনেক সময় বলা হয় কীর্তিনাশা। অথচ এই নদীই বাংলাদেশকে সুজলা, সুফলা করেছে; তার দুই তীরে মানুষের বসতি, কৃষি, গ্রাম, নগর, বাজার, বন্দর, সম্পদ, সমৃদ্ধি, শিল্প, সাহিত্য, ধর্মকর্ম সবকিছুরই বিকাশ। বাঙালি তাই এসব নদীকে যেমন ভয়ভক্তি করেছে, তেমনই আদর করে তাদের নাম রেখেছে ইছামতী, ময়ূরাক্ষী, রূপনারায়ণ, মহানন্দা, মেঘনা, সুরমা, লৌহিত্য, কীর্ত্তনখোলা কিংবা কপোতাক্ষ।

ভূ-প্রকৃতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম, কুমিল্লার কিছু অঞ্চল, সিলেটের পূর্বাঞ্চল, টাঙ্গাইলের মধুপুর গড় ও গাজীপুরের ভাওয়ালের গড় মিলে কিছু পাহাড় আছে। বাংলাদেশের আর সকল ভূমিই নতুনভূমি; এখানে সর্বত্র খালবিল আর বিরাট জলাভূমি। এই নবভূমির মধ্যে আবার ঢাকা বিভাগ, কুমিল্লা ও সিলেটের বহুলাংশের গঠন পুরনো। প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতির অনেক নির্দশন এসব জায়গায় পাওয়া গেছে। আর খুলনা, বাখেরগঞ্জ, সমতল-নোয়াখালি ও সমতল-চট্টগ্রামের গঠন নতুন।

উর্বর পলল ভূমি, চর ও অরণ্য

ঐতিহাসিক কালে বাংলাদেশে সব থেকে বেশি ভাঙাগড়া হয়েছে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে। পদ্মা, ভাগীরথী ও তাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় যে বিপুল পলিমাটি ভেসে আসে তার জন্যে নিম্নভূমি বার বার তছনছ হয়ে কখনো সেখানে সমৃদ্ধ জনপদ, কখনো গভীর অরণ্যের সৃষ্টি হয়েছে, কখনো তা জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে কিংবা নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। ষষ্ঠ শতকে পানি সরে গিয়ে গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়া অঞ্চল তখন সবেমাত্র মাথা তুলেছে; তাই তাকে বলা হতো নতুন জেগে ওঠা চর । এই জনপদ ছিল প্রায় সমুদ্রের তীরে। আজ যে সুন্দরবন অঞ্চল জনহীন অরণ্য। ছয় শতক থেকে তের শতক পর্যন্ত সেখানে ছিল মানুষের ঘনবসতিপূর্ণ জনপদ। নিম্নভূমির এই ভাঙাগড়া আজও একটানা চলছে।

নদ-নদী পরিবেষ্টিত ভূমি

বাংলার মাটিতে যুগ যুগ ধরে অনেক ভাঙাগড়া হয়েছে। নানান প্রাকৃতিক ওলট পালটের ফলে পুরনো মাটি বাতিল হয়ে নতুন মাটি বা নবভূমি জেগে উঠেছে, তাতে ভূ-প্রকৃতির কোনো মৌলিক বদল হয়নি। 'বাংলা' এই নামের সঙ্গে বাংলার নদ-নদী জড়িয়ে আছে। এসব নদ-নদীই বাংলার প্রাণ। এসব নদ-নদীই বাংলাকে গড়ে তুলেছে। যুগে যুগে বাংলার আকৃতি-প্রকৃতি নির্ণয় করেছে, আজও করছে। বাংলার নদ-নদীর খাত গত একশো বছরেও যে পরিবর্তন ঘটিয়েছে তাতে অবাক হয়ে যেতে হয়।

আবহাওয়া ও জলবায়ু

বাংলার জলবায়ু বরাবরই নাতিশীতোষ্ণ। তবে পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষত বীরভূম-বর্ধমানের পশ্চিমাংশে এবং কতকটা মেদিনীপুরেও গ্রীষ্মের তাপ প্রখরতর; অন্যত্র গ্রীষ্মের হাওয়া উষ্ণ জলীয়। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে বৃষ্টি বেশি হয়। ভারত মহাসাগরের মৌসুমীবায়ু হিমালয়, গারো, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়ে প্রতিহত হয়ে সমগ্র উত্তর-পূর্ব বাংলাকে বৃষ্টিতে

ভাসিয়ে দেয়। বসন্তকালে আরেকটি বায়ু প্রবাহ দেখা যায়; এই বায়ু প্রবাহ উত্তর-পূর্ববাহি। যেহেতু এই বাতাস মালয় পর্বত স্পর্শ করে আসে সেই জন্য কাব্যসাহিত্যে বসন্তের বাতাসকে বলে মলয় পবন। বর্ষায় অবিরল বৃষ্টিপাত পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

জনজীবনের উপর ভৌগোলিক প্রভাব

কৃষি নির্ভরতা

বাংলাদেশের ভূমি খুবই উর্বর । এজন্যে বাংলাদেশের মানুষ প্রাচীন কাল থেকে মূলত কৃষিজীবী। সুদূর অতীত থেকে এদেশের কৃষি প্রাচুর্যের জন্যে বিখ্যাত। বাংলাদেশে অল্প পরিশ্রমে অধিক খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয়।

লোক-প্রকৃতিঃ শান্ত, কর্মঠ ও বিদ্যানুরাগী

উর্বর ভূমি ও মৃদু আবহাওয়া বাংলাদেশের মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে কোমল, শান্ত ও আবেগী স্বভাবের করে গড়ে তুলেছে। সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙ এ দেশে এসেছিলেন। তাঁর মতে, বাংলার লোকেরা স্পষ্ট কথা বলে, এরা গুণবান এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান। সমতটের লোকেরা কর্মঠ ও সাহসী; কর্ণসুবর্ণের লোকেরা ভদ্র, সচ্চরিত্র এবং তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগী। বিদ্যাচর্চার প্রতি বাঙালির অনুরাগের খবর অনেক প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যায়। বাঙালিরা ছাত্র-শিক্ষক হিসেবে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় এবং ভারতবর্ষের বাইরেও যাতায়াত করত।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামী

বাংলাদেশের অবস্থানের কারণে এখানে কাল বৈশাখী, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস বা বন্যা হয়। প্রকৃতি বাংলাদেশের অধিবাসীকে কিছুটা আয়েসী করে তুললেও নদী ও সমুদ্র এখানকার মানুষকে করেছে বিদ্রোহী এবং দিয়েছে প্রতিরোধ ক্ষমতা। নদীর দু-পাড় জুড়ে তাই যুগ যুগ ধরে অনবরত চলছে ভাঙা আর গড়া। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে এদেশবাসীর মানসিকতা একদিক থেকে যেমন সহনশীল, অন্যদিক থেকে চিরসংগ্রামী। তারা বিপর্যয়ের মুখে ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করে।

নৌ-কুশলী বাঙালি ও সমুদ্র বাণিজ্য

নদ-নদী ও পানিবেষ্টিত থাকার কারণে বাংলাদেশের মানুষ নৌকা নির্মাণ ও পরিচালনায় দক্ষ। নৌ-যুদ্ধে বাংলার অধিবাসীদের সুখ্যাতি ছিল। প্রাচীনকালে ও মুসলিম যুগে এদেশে সু-শৃঙ্খল নৌ-বহর গড়ে উঠেছিল । প্রাচীনকালে বাংলার মানুষের নদীপথে যেমন দেশের মধ্যে, তেমনই সমুদ্রপথে দেশের বাইরেও যাতায়াত ছিল। উত্তর আসামের রেশমজাতীয় জিনিসপত্র, পান, সুপারি, চন্দনকাঠ, বাঁশ, তেজপাতা ইত্যাদি ব্রহ্মপুত্র-সুরমা-মেঘনা নদীর জলপথ দিয়েই বাংলাদেশে আসত। প্রাচীন বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য ও বাণিজ্যপথের যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে।

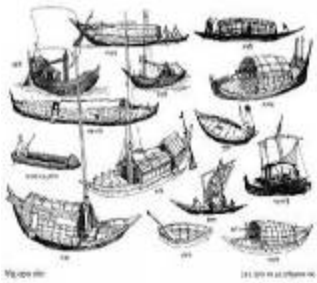

বাংলাদেশের নানা রকমের নৌকা

রাজনৈতিক জীবনের উপর ভৌগোলিক প্রভাব

উত্তর ও পূর্বদিকে পাহাড়, টিলা এবং দক্ষিণ দিকে সমুদ্র বাংলাদেশকে প্রাচীনকাল থেকেই প্রাকৃতিকভাবে বেষ্টিত করে রেখেছে। ফলে বাংলাদেশকে খুব একটা বৈদেশিক আক্রমণ মোকাবিলা করতে হয়নি। বিদেশী শক্তির লোভী দৃষ্টি থেকে প্রকৃতিই বাংলাদেশকে আড়াল করে রেখেছিল এবং প্রাচীনকালে বহু বছর বাংলার নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় ছিল। উত্তর ভারত থেকে এদেশে মাত্র দুটি পথ ধরে বাংলায় প্রবেশ করা যেত: একটি ত্রিহুত বা উত্তর বিহারের মধ্য দিয়ে এবং অন্যটি রাজমহলের নিকট তেলিয়াগড়ের সরু পাহাড়ি পথ ধরে। প্রাকৃতিক কারণে দুটি পথ ধরে বাংলায় প্রবেশ সহজসাধ্য ছিল না বলে ভারতের বিভিন্ন রাজশক্তি সহজে প্রাচীনকালে সম্পদশালী বাংলাদেশকে সহজে অধিকার করতে পারেনি এবং তাদের অভিযান বেশিরভাগই বিফল হয়েছে। কখনো কখনো সাফল্য এলেও ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

মৌর্য ও গুপ্ত শাসকগণ অল্প সময়ের জন্যে বাংলায় তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এভাবে প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবন একটি নিজস্ব ধারায় গড়ে উঠতে থাকে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রভাব

বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্টের প্রভাব এদেশের মানুষের পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের উপরও পড়েছে। বাংলার অধিবাসীদের খাদ্য, পোশাক, ঘরবাড়ি, জীবনাচার ইত্যাদি ভৌগোলিক বৈশিষ্টের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে। এছাড়া বাংলার ভূ-প্রকৃতি, তার নদনদীর বিস্তার ও বিপুল পলিমাটি এ দেশটিকে গড়ে তুলেছে মৃৎ শিল্প চর্চার এক আদর্শ ক্ষেত্র হিসেবে। প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্যবাহী পোড়ামাটির শিল্প এখানকার ভৌগোলিক পরিবেশকে আশ্রয় করেই বিকশিত হয়েছিল। বাংলাদেশে আদিমকাল থেকেই জলপথে নৌকার ব্যবহার চলে আসছে। নদীমাতৃক বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন এবং আনন্দ উৎসবে নৌকা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বাঙালির মন যে নৌ-যানের তারে বাঁধা ছিল, তা সহজেই বোঝা যায়।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ এখানকার নগর বন্দরের উত্থান-পতনের সাথেও জড়িত। নদীর গতি পরিবর্তন ও অন্যান্য ভৌগোলিক কারণে বহু প্রাচীন বন্দরের উত্থান ও বিলুপ্তি ঘটেছে। প্রাচীন যুগে পুণ্ড্রনগর, গৌড়, বিক্রমপুর, দেবপর্বত (ময়নামতি) ইত্যাদি শহর নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলাদেশের একটি প্রাকৃতিক মানচিত্র আঁকবেন এবং সেখানে হলুদ রং-এ পাহাড়ি অঞ্চল ও বনভূমি দেখাবেন, সবুজ রং-এ সমগ্র সমতলকে চিহ্নিত করে নীল রং দিয়ে নদনদী ও দক্ষিণের বঙ্গোপসাগরকে ফুটিয়ে তুলবেন।

সারসংক্ষেপ

নদীমাতৃক বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি গড়ে উঠেছে নদ-নদীকে কেন্দ্র করে। নদী দিয়ে বয়ে আসা পলিতে গড়ে উঠেছে ভূমি, এদেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ তবে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। যে কারণে বাংলাদেশের নদীগুলো জনজীবনের যাবতীয় বিষয়ের উপর প্রভাব ফেলে। নদী-নদী একদিকে করে তোলে মানুষকে সংগ্রামী অপরদিকে খুলে দেয় সমৃদ্ধের দ্বার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনটিকে বাংলার প্রাণ বলা হয়?
ক) এখানকার টিলা পাহাড়কে খ) বনভূমিকে গ) নদ-নদীকে ঘ) ফসলের মাঠকে

২। বিদেশী আক্রমণ থেকে বাংলা মুক্ত ছিল কেন?
ক) সুশৃংখল নৌবাহিনীর জন্য খ) সুউচ্চ পর্বতমালা থাকায়
গ) প্রাকৃতিক বেষ্টনির কারণে ঘ) রুক্ষ শুষ্ক জলবায়ুর জন্য

৩। বাংলাদেশে শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিক প্রযোজ্য বাক্যটি?
i) বেশি পরিশ্রম কম ফলন ii) অল্প পরিশ্রম বেশি ফলন iii) বেশি পরিশ্রম বেশি ফলন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল উৎস ছিল
ক) বাণিজ্য খ) কৃষি গ) মৎস্যচাষ ঘ) পশুপালন

৫। প্রাচীন পুঁথিতে বাঙালির কোন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়?
ক) চরিত্রবান খ) বিদ্যানুরাগী গ) পরিশ্রমী ঘ) সাহসী

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১ ঃ ১. ক ২. গ ৩. খ ৪. গ ৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২ ঃ ১. গ ২. গ ৩. খ ৪. খ ৫. খ